নারী শিক্ষা বিস্তারে বেগম রোকেয়ার ভূমিকা

আরিফা সুলতানা*

বাঙালী মুসলমান নারীর শিক্ষা বিস্তার সাধনার নিরলস তাপসকর্মী, অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধিসংগ্রামের পথিকৃৎ, নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত এবং মুক্ত চিন্তায় উদ্বুদ্ধ সাহিত্য সেবী বেগম রোকেয়ার পরিচিতি সুবিদিত। ভারত উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন রোকেয়া সাখাওয়াত। তিনি বেশ বুঝতেন যে, নারীর অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির ও তা বৃদ্ধির পুর্ব শর্তই হচ্ছে নারীকে সুশিক্ষিত করে তোলা। রোকেয়া তার গোটা জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পেরেছেন শিক্ষা কিভাবে উন্নয়ন ও অগ্রগতির উৎস হিসেবে কাজ করে। তাই তিনি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়ার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এবং নারী শিক্ষা বিস্তারের ব্রতকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের মধ্যে দিয়ে কর্ম জীবনের সমগ্র সময় কালের শক্তি উদ্যম নিবেদন করে নারী শিক্ষার প্রসারতা আনায়নের চেষ্টা করেছিলেন। তার সেই সাহসী ভূমিকায় বাঙালি মুসলমান সমাজ ক্রমে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তাই নারী শিক্ষায় বেগম রোকেয়ার অবদান প্রশংসার সাথে মূল্যায়িত হয়েছে। তিনি নারীকে উদ্বুদ্ব করেছেন, প্রেরণা দিয়েছেন। নারী অধিকার ও তা আদায়ের পন্থা সম্পর্কিত তার বক্তব্য আজো সমাজ কর্মীদের প্রেরণার উৎস। তার শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসও প্রশংসনীয়। তাই রোকেয়ার মুসলিম নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টার বিষয়ে আলোকপাত করার ক্ষুদ্র প্রয়াস এই প্রবন্ধ।

বাংলার মুসলমানদের অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধ গোঁড়ামির যুগে অনন্য প্রতিভার অধিকারী বেগম রোকেয়া ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের রংপুর জেলার পায়রাবন্দ নামক গ্রামের এক অভিজাত রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগহণ করেন এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে লোকান্তরিত হন। তাঁর পিতা জহিরুদ্দীন আবু আলী সাবের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। জহিরুদ্দীন অপব্যয়ী, আরামপ্রিয় ও বিলাসী ছিলেন। তার জীবনকালেই তিনি পৈত্রিক অর্থ ও সম্পত্তি অপব্যয় ও বিনষ্ট করেন। বেগম রোকেয়ার মাতার নাম রাহাতুন্নেসা সাবের চৌধুরাণী। তিনি রক্ষণশীল ও পর্দা প্রথার গোঁড়া সমর্থক ছিলেন।[১] তৎকালীন সমাজের প্রচলিত অবরোধ প্রথার কঠোরতা সাবের পরিবারে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং স্ত্রীশিক্ষা এই পরিবারে পাপকার্য বলে গণ্য করা হতো।[২] তখনকার সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক পারিবারিক পরিবেশে বেগম

• Arifa Sultana, Associate Professor, Department of Philosophy, JU

রোকেয়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু তার জ্ঞান পিপাসা ছিল অসীম। এ বিষয়ে অগ্রজ ইব্রাহীম সাবের এবং অগ্রজ করিমুন্নেসার অপরিসীম সহযোগিতা পেয়েছিলেন তিনি। ইব্রাহীম সাবের অনেক যত্নের সঙ্গে বেগম রোকেয়াকে পড়াতেন এবং আলাপ আলোচনা করতেন দেশ-বিদেশের নানাবিধ কাহিনী নিয়ে।[৩] তার সময়ে সমাজে নারীর জীবনযাপন সম্পূর্ণতই ছিল আরোপিত। অর্জিত গুণের মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধন করার তেমন সুযোগ ছিল না। এমনকি, মেয়েদের পছন্দ অনুযায়ী লেখাপড়ার সুযোগ ও অধিকার ছিল না সেখানে। অভিভাবকেরা উর্দু, ফার্সি ও আরবি পড়ার অনুমতি দিলেও মাতৃভাষা পড়ার অনুমতি দিতেন না। রোকেয়া উল্লেখ করেছেন, ..আত্নীয়গণ আমার উর্দু ফার্সি পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাংলা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন।[৪] বেগম রোকেয়ার পিতাও মেয়েদের বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন।[৫]

এরকম বদ্ধ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত হলেও বেগম রোকেয়া নিজেকে এর বাইরে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ রোকেয়া ছোটবেলা থেকে সামাজিক কুসংস্কার মেনে নিতে পারেননি। নারীর প্রতি হৃদয়হীন উদাসীনতা, সামাজিক অত্যাচার, অমানবিক আচরণ ও বৈষম্য তার মনকে ব্যথিত করেছে তাই তিনি প্রথমে আত্মোন্নতির জন্য শিক্ষা সাধনা করেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অন্ধ গোঁড়ামি ও কূপমন্ডকতার অবরোধে মুসলমান নারী অধোগতিতে নিপতিত হয়েছে। উপলব্ধির উৎকর্ষ দিয়ে রোকেয়া নারীর বিরুদ্ধে ইতিহাসের এই পক্ষপাতদুষ্টতাকে অবমুক্ত করতে চেয়েছেন।

মুসলিম বোধ ও সামাজিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা রোকেয়া প্রথাগত মুসলিম নর-নারীর মতো হননি। জীবনাচরণ, লেখনী সব কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি অশিক্ষা কুশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন।

ঊনবিংশ শতকে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজের সামাজিক ও আইনগত অধিকার বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। এর বড় কারণ ধর্মীয় কুসংস্কার। তখনকার মানুষের জীবন ও সংস্কৃতিতে এই সংস্কার এতো ভয়াবহ পর্যায়ে ছিল যে, সেখানে মুক্ত চিন্তা ও যুক্তিবোধ মোটেও শক্তি সামর্থ্য নিয়ে জায়গা করে নিতে পারেনি। রোকেয়ার আগে রামমোহন রায়ও লক্ষ্য করেছেন ধর্মীয় কুসংস্কার কীভাবে যুক্তিহীনতার ভেতর দিয়ে আধিপত্যের জায়গা দখল করে নিয়েছে। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন আমাদের সংস্কৃতিতে নারী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হলো “নারী একারণে উপকারী যে, সে শুধু রান্না-বান্না, যৌন-সঙ্গি এবং বিশ্বস্ত গৃহকর্মী।”[৬]

তাই বাঙালি নারীর, বিশেষত বাঙালী মুসলিম নারীর মুক্তি সাধনই ছিল বেগম রোকেয়া আরাধ্য বাসনা। নারী শিক্ষার বিস্তারকে তিনি এ ক্ষেত্রে চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করেন। আর এ কাজকেই তিনি তার জীবনের প্রধান কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেন। এজন্য মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কাজে তিনি জীবনের বেশিরভাগ কর্ম-

সময় ব্যয় করেছেন। তবে এ কর্তব্য কাজের উৎসভূমিটি নিহিত রয়েছে তার সাহিত্যচর্চার মধ্যে। তিনি সুদীর্ঘ তিন দশক কাল সাহিত্যচর্চা করেন। তেইশ বছর বয়সে এর যাত্রা শুরু হয় এবং মৃত্যু আগের রাত্রি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তিনি পাঁচটি গ্রন্থ, ষোলটি প্রবন্ধ, ছয়টি ছোট গল্প ও রস রচনা এবং সাতটি কবিতা লেখেন। কিন্তু তার সাহিতচর্চা নিছক সাহিত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে হয়নি। তারও মূল দিক ছিল সমাজ তথা নারীসমাজের হিত সাধন। "বাঙলি, ব্যাঙালি মুসলমান, নারীশিক্ষা, নারীজাগরণঃ তার ভাবনাশীলতা এইসবকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। স্কুল প্রতিষ্ঠা, নারী কল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা : এইসব তাঁর কর্মের পরিধি। আর লেখিকা হিসেবে গল্প, কবিতা উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি আত্নপ্রকাশ করেছেন। কিন্ত সেইসবের মধ্যে দিয়েও একটি আকাঙ্ক্ষাই তীব্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছে : নারীজাগরণ তথা সমাজহিত।[৭] বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা আন্দোলনের পূর্বে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারের কিছু প্রচেষ্টা চলছিল, কিন্তু তা ছিল সীমিত পর্যায়ে। এক্ষেত্রে বেগম রোকেয়াই সর্বপ্রথম দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হন ; এবং সমাজে নারী শিক্ষার পক্ষে শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শিক্ষা ভাবনা

শিক্ষা সাধারণত যে কোন ধরনের নিয়ম মাফিক প্রতিষ্ঠানগত বিদ্যার্জনকে আখ্যায়িত করে। কিন্তু এই আখ্যায়নের পরিধি ব্যাপক এবং সময় ও পরিস্থিতি ভেদে ভিন্ন অর্থ বহন করে। যেমন আঠারো শতকে শিক্ষার অর্থ ছিল শাস্ত্রীয় জ্ঞান, লেখা ও পড়ার সক্ষমতা, বড়জোর হিসেব রাখার বা কবিতা লেখার বা ইতিহাস লেখার ক্ষমতা। তবে কবিতা লেখার বা ইতিহাস লেখার ক্ষমতা সীমিত ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করা হতো। সাধারণ জ্ঞানার্জনের বাইরে সাহিত্য বা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন নারীদের রয়েছে বলে মনে করা হতো না। কিন্তু সেই সময়ে বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং নারী শিক্ষার প্রশ্নে তিনি নারীর সামাজিক অবস্থান, অধিকার ও মর্যাদার কথা তুলেছেন। "প্রথমেই শিক্ষার প্রসঙ্গটা আসেনি, এসেছে সমাজে নারীর অবনতির এক ভয়াবহ বর্ণনা। নারীকে চিত্রিত করা হয়েছে দাসী হিসেবে।"[৮] এই দাসত্ব থেকে নারীকে মুক্তি দেওয়াই ছিল রোকেয়ার শিক্ষা চিন্তার লক্ষ্য। এসময় নারী জাগরণের চিন্তা তার মধ্যে কতখানি ঘনীভূত হয়েছিল তা বোঝা তাঁর *Sultana's Dream* (১৯০৮) রচনা থেকে। নারী স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁর চরম দৃষ্টিরভঙ্গির প্রকাশ ঘটে এতে। তাই স্ত্রীশিক্ষাকে উপলক্ষ করে তার শিক্ষা সম্পর্কিত মতামত উপস্থাপন করেছেন। তিনি সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরষের বৈষম্যকে অযৌক্তিক বলেই বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একটা পরিবারের পুত্র ও কন্যার যেরকম সমকক্ষতা থাকা উচিত শিক্ষা ক্ষেত্রে সেটাই প্রয়োজন।[৯] তিনি বলেছেন, ঈশ্বর ও মায়ের কাছে মেয়েরা ছেলেদের অর্ধেক নয়। যদি তাই হতো তাহলে এই রকম বন্দোবস্ত

স্বাভাবিক হতো যে, ছেলে যেখানে দশ মাস মাতৃগর্ভে থাকবে মেয়ে সেখানে পাঁচ মাস থাকবে। ছেলেদের জন্য মায়ের স্তনে যতটা দুধ আসে মেয়ের জন্য তার অর্ধেক আসবে, কিন্তু প্রকৃতিতে তো সে রকম নিয়ম নেই।[১০] তিনি আরো বলেছেন, "আমাদের শয়ন-কক্ষে যে সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রুপ মনোকক্ষে জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল-কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করতে পারে-কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি?[১১]

নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা তিনি সবার উপরে তুলে ধরেছেন। নারীর মুক্তির কথা চিন্তা করেছেন। এখানে তাকে লিঙ্গকেন্দ্রিক এক সংকীর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে দোষারোপ করা চলে না। নারী সমাজের একজন হিসেবে নিজের সামগ্রিক বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে নারীর প্রতি তাঁর সহমর্মিতা স্বাভাবিকভাবেই চলে এসেছে। তাই শিক্ষাকে তিনি গতানুগতিক দৃষ্টিতে শুধু চাকরি লাভের উপায় হিসেবে দেখেননি। শিক্ষাকে তিনি দেখেছেন নারী পুরুষ ভেদে মানুষের অন্তর্জাত শক্তির উপায় হিসেবে। স্ত্রী জাতির অবনতি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের "অন্ধ-অনুকরণ" নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়েছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলনের দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা। ঐ গুণের ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ।"[১২] বেগম রোকেয়া আরো বলেন, সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে যে হাত, পা, চোখ, কান, মন এবং চিন্তাশক্তি দিয়েছেন, আমরা যদি সেগুলোকে সবল করি, হাত দিয়ে সৎ কাজ করি, চোখ দিয়ে কার্যকরভাবে প্রত্যক্ষ করি, কান দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে শুনি এবং চিন্তাশক্তি দিয়ে আরো সুক্ষ্মভাবে চিন্তা করতে শিখি, তবে সেটাই প্রকৃত শিক্ষা।[১৩] বেগম রোকেয়া বলেছেন, প্রকৃত সুশিক্ষা চাই যাতে মস্তিষ্ক ও মন উন্নত হয়।[১৪] তার মতে, সুশিক্ষার অভাবেই হৃদয়বৃত্তি সঙ্কুচিত হয়ে যায়।[১৫]

শিক্ষার এই সংজ্ঞা থেকে রোকেয়ার দার্শনিক অবস্থানটি লক্ষ করা যায়। শিক্ষা বলতে তিনি শুধু সনদ অর্জন করা, অর্থ উপার্জন করাকে বুঝাননি। শিক্ষাকে তিনি মনো-প্রক্ষোভিক (mental reflection) মধ্যস্থতাকারী হিসেবে চিন্তা করেছেন। প্রকৃত শিক্ষার উত্তরে রোকেয়া মূলত অভিজ্ঞতাবাদী অনুসন্ধানকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। কারণ ইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখে যে জ্ঞান অর্জিত হয় সে জ্ঞান ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করে। আর সম্পৃক্ত জ্ঞানই কেবল পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম। সুতরাং লক্ষ্য গত দিক থেকে রোকেয়ার শিক্ষাদর্শন অভিজ্ঞতাবাদী। আবার প্রয়োগবাদীও (Pragrnatic)। কারণ রোকেয়া শিক্ষাকে সামাজিক জীবনের উন্নয়ন সাধনের প্রথম সোপান মনে করেন আর সেই উন্নয়নে নারী পুরষ উভয়কে সমানভাবে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমুহের প্রয়োগ বলতে তিনি শুধু সফলতা অর্জনকে বুঝাননি। শিক্ষার মধ্য দিয়ে কিভাবে আর্থসামাজিক উন্নয়ন, ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন তথা মানবিক

বোধের উন্নয়ন সম্ভব, সে বিষয়ের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। এই দিক থেকে রোকেয়ার শিক্ষাভাবনা আধুনিকতর।

শিক্ষা নিয়ে তার ভাবনার প্রতিফলন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে বিভিন্ন বক্তৃতায় ও লেখায়। তবে শিক্ষা অর্জনে তিনি আধুনিক প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের মতোই সোচ্চার। প্রয়োগবাদী দার্শনিক ডিউঈ যেমন মানুষ ও সমাজের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার্থীকে কিভাবে দক্ষ করে তোলা যায়, শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয় এবং অন্যান্য অঙ্গাদিকে কাজে লাগানো যায় সেরকম ধাচের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। ডিউঈর এরকম দক্ষতা নির্ভর শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন রোকেয়া। প্রয়োগবাদী শিক্ষা চিন্তার প্রতিফলন আমরা লক্ষ করি রোকেয়ার এই উদ্বৃতিতে "শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি, গোটা কতক পুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে,..। শিক্ষা-মানসিক এবং শারিরীক উভয়বিধ হওয়া চাই।"[১৬] তাহাদের (নারীদের) জানা উচিত যে, তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ি, ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আসে নাই, বরং তাহারা বিশেষ কর্তব্য সাধনের নিমিত্তে নারীরূপে জন্মলাভ করিয়াছে। তাহাদের জীবন শুধু পতিদেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্তে উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে। তাহারা যেন অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়। শারীরিক শিক্ষার জন্য আমার মতে লাঠী ও ছোরা খেলা, ঢেঁকির সাহায্যে ধান ভানা, যাঁতায় আটা প্রস্তুত করা এবং যাবতীয় গৃহকর্ম শিক্ষা দেওয়া প্রশস্ত।[১৭] তিনি শুধু লাপঝাঁপ, নাচ ইত্যাদির চেয়ে ঐ ধরনের শরীর চর্চা শতগুনে শ্রেয় বলেছেন।[১৮]

বেগম রোকেয়া শিক্ষার মাধ্যমে অজ্ঞতা কুসংস্কার দূর করে মানুষকে মুক্তমন, শালীন ও রুচিবান করতে চেয়েছিলেন। এবং সেই অজ্ঞতা কুসংস্কার মুক্ত শালীন রুচিবান শিক্ষা দিয়ে বেগম রোকেয়া মুসলিম নারীদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "টাকা উপার্জন করাই যে শিক্ষালাভের মূলউদ্দেশ্য, ইহা আমি কোনকালেই স্বীকার করি নাই। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা। আবার কেবল বি. এ, এম.এ পাশ করিলেও অনেক স্থলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। লেখাপড়া পরীক্ষা পাশের জন্য না হইয়া জ্ঞান লাভের জন্য হওয়া উচিত।"[১৯] শিক্ষা যে শুধু জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম নয় রোকেয়ার উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, বালিকাদিগকে নানাভাবে দেশ ও জাতির সেবা এবং পরোপকার ব্রতে উদ্ধুদ্ধ করে তোলাও শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যের অন্যতম হাওয়া উচিত বলে তিনি নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২০] তাই বলা যায় শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে একজন ব্যক্তি যেন ন্যায় অন্যায়, ভালো-মন্দ এই পার্থক্য জ্ঞানটুকু অর্জন করতে পারে এবং তার আলোকে দেশ ও দশের সেবা করতে পারে সে দিকটির প্রতি তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

রোকেয়া বাস্তবভিত্তিক শিক্ষার কথা প্রচার করেছেন। শিক্ষার এই বাস্তবতাবোধ এসেছিল রোকেয়ার বিজ্ঞান চেতনা থেকে, সকল কিছুকে যুক্তিবাদী চোখে বিচার করার পরিপ্রেক্ষিত থেকে। তিনি মনে করেন, ব্যক্তির জ্ঞানচক্ষু মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে তুলে। আর এই যুক্তিবাদী মানসিকতা শুধু নারী জাতীর উন্নয়ন নয়, সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য খুবই প্রয়োজন। বেগম রোকেয়া ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, বাঙালী মুসলিম সমাজ শিক্ষার আলো থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখছে। আর এই বঞ্চনার হাত থেকে পরিত্রান পাবার উপায় হচ্ছে শিক্ষা। তাই রোকেয়া তার শিক্ষা ভাবনার বাস্তবায়ন করতে চেয়েছেন প্রধানতঃ বাঙালী মুসলিম নারী সমাজের জন্য।

মুসলিম নারীর জন্য শিক্ষা

শৈশব ও কৈশরের অবরুদ্ধ নারী-জীবনের অভিজ্ঞতা এবং পরবর্তীকালে ইংরেজী শিক্ষার বাতায়ন পথে সঞ্চারিত ইউরোপীয় নারী মুক্তি ও সমানাধিকারের চেতনা রোকেয়াকে নারী জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেই সাথে যুক্ত হয়েছিল আপন সমাজের নারীদের জন্য তার গভীর দরদ ও কঠোর দায়িত্ববোধ। রোকেয়ার সমস্ত কর্মদ্যোগ এমনকি তার সাহিত্য সাধনার মূলেও রয়েছে, মনে রাখতে হবে এই বেদনা ও কর্তব্যবোধ।

সে যুগেও রোকেয়া ঠিকই বুঝেছিলেন নারীর মুক্তি নিজেকেই আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়ে অর্জন করতে হবে। আর তার জন্য সবার আগে চাই শিক্ষা। এখানে শিক্ষা মানে কেবল ধর্ম পালন, স্বামী ও গুরুজনের সেবা, সন্তান প্রতিপালন কিংবা সংসার পরিচালনার জ্ঞান নয় সত্যিকার জীবন উদ্বোধক শিক্ষা। তাই নারী শিক্ষা বিস্তারকেই তার জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর এই ব্রত পালন করতে গিয়ে সে দিন তাকে সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছিল।

বেগম রোকেয়া জোরালোভাবে নারী শিক্ষা সমর্থন করেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার মাধ্যমেই নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে এবং তাদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হবে। এজন্য মুসলিম নারীদের তিনি এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন যাতে তারা তাদের মানসিক শক্তি ফিরে পায়। উচ্চ সামাজিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। কার্যক্ষেত্রে, সামাজিক উন্নয়নে যেন নারী ভূমিকা রাখতে পারে সেরকম করে গড়ে তোলার দায়িত্ব রোকেয়া গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গের সূত্র ধরে তিনি Educational Ideals for the Modern Indian এ বলেন, "Our girls should not only obtain University degress,but must be ideal daughters, wives and mothers, or I may say obedient, loving sisters, dutiful wives and Instructive mothers."[২১]

নারীর মধ্যে কীভাবে আদর্শকে সক্রিয় করে তোলা যায়, তাই ছিল রোকেয়ার প্রতিদিনকার প্রচেষ্টা ও ভাবনা। এই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সাখাওয়াত মেমেরিয়াল গার্লস স্কুল। সেখানে রোকেয়া আধুনিক ধারার শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। আর শিক্ষা বলতে বেগম রোকেয়া প্রকৃত সুশিক্ষা বোঝেন এবং

তার মতে শুধু গোটা কতক বই পড়তে পারা বা দু'ছত্র কবিতা লিখতে পারা শিক্ষা নয়। তিনি চেয়েছেন সেই শিক্ষা যা শিক্ষার্থীদেরকে নাগরিক অধিকার অর্জন করতে সক্ষম করবে। এই শিক্ষা মানসিক ও শারিরীক দুই রকম হতে হবে।[২২] মানসিক ও শারিরীক শিক্ষার আওতায় রোকেয়া বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র এই সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি শিক্ষাক্রমে সাধারণ বিষয়াবলির সাথে পুষ্টিবিদ্যা, পশুপালন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, উত্তাপতত্ত্ব প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করেন। এছাড়া তিনি গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সূচিবিদ্যা, শুশ্রূষা প্রণালী, সন্তান লালন প্রণালী প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[২৩] পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর জ্ঞান আহরণ করে নারীরা যাতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে লক্ষ্যে তিনি তা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি নানা যুক্তি-প্রমাণ দাঁড় করেছেন। গৃহিণীদের ঘরকন্নার দৈনিক কাজগলো সূচারুরূপে সম্পাদন করবার জন্য বিশেষ জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। বাসগৃহের পরিবেশ সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত করা, পরিমিত ব্যয়ে সংসার পরিচালনা করার জন্য তিনি মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।[২৪] তবে নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা ও চরিত্র গঠনের প্রতি বেশী মনোযোগ দিতে চেয়েছেন। তার মতে, মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ না করিয়ে দেশ ও ধর্মকে অধিক ভালোবাসতে শিক্ষা দেওয়া দরকার।[২৫] পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞান পাঠের উপর রোকেয়া বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সৌরজগত গল্পে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের কথাই বলেছেন প্রথমে।[২৬] 'সুলতানার স্বপ্ন' গল্পটিতেও বিভিন্নভাবে বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতার কথা বর্ণনা করেছেন এবং অল্প বয়স থেকেই যে এই পাঠ শুরু করা দরকার তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয়গুলোর বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য গভীর অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন। কারণ বিজ্ঞানের চর্চাই যে উন্নয়নের চাবিকাঠি সে সম্বন্ধে তার মনে কোন দ্বিধা ছিল না । তার এই মনোভাব তিনি সুলতানার স্বপ্ন রচনায় সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি রোকেয়া ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিষয় শিক্ষা দেয়ার কথাও বলেছেন। এছাড়া ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারটিকেও তিনি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে কেরেছন।[২৭] মাতৃভাষা ছাড়াও ইংরেজি ও অন্য কিছু ভাষা শেখাও যে আত্মোন্নয়নের পক্ষে উপকারী, তিনি সে ইঙ্গিতও দিয়েছেন।[২৮] তিনিও বুঝতে পেরেছেন বৈজ্ঞানিক ও মানবিক উভয় ধরনের জ্ঞান না থাকলে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ সুষম হবে না। ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন স্থানের পরিবেশ ও মানুষের জ্ঞান দানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। রোকেয়ার মতে, প্রকৃতি আমাদের ভোগের জন্য তার অক্ষয় ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চয় করে রেখেছে, আমাদের উচিত অতল জ্ঞানসাগরে ডুবে সেই রত্ন আহরণ করা। সুতরাং এজন্য যা কিছু দরকার তার সবই শিক্ষার্থীর পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে।[২৯]

মানসিক শিক্ষার মধ্যে আর যে দুটি বিষয়ের উপর রোকেয়া বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা। তার মতে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কোরআন শিক্ষাদান করা সবচেয়ে বেশি দরকার। কারণ তিনি মনে করেন, আসলে প্রাথমিক শিক্ষা বলতে যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরআনে পাওয়া যায়।[৩০] তার মতে, কোরআনের সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানা প্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কোরআনের বিধান অনুযায়ী ধর্ম কর্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।[৩১] নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে রোকেয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে সেসব গুণাবলীর উন্মেষ দেখতে চেয়েছেন যে গুলোর মধ্যে রেয়েছে সত্যবাদিতা, আত্মনির্ভরতা, সাহসিকতা, কর্তব্যবোধ, একতা, শিষ্ঠাচার ইত্যাদি।

অবসর বিনোদনের শিক্ষাও তার পাঠ্যক্রমে গুরত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। অবসরে তিনি ছবি আকাঁ ও সঙ্গীত শেখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।[৩২] নাচ, আবৃতি, অভিনয় ইত্যাদি বিষয় গুলোও তার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩৩] বেগম রোকেয়া বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে হাতের কাজেরও একটা বিশেষ স্থান দিয়েছেন। শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে নানা রকম হাতের কাজ করানোকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেননি বরং সেই সব শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনী করার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছেন। অর্থাৎ মেয়েরা যেন বিভিন্ন কাজে পারদর্শি হতে পারে, সেজন্য তিনি শেখাতেন হোমনার্সিং, ফাস্ট-এড, রন্ধন, সেলাই ইত্যাদি সব টেকনিক্যাল বিষয় সমূহ। রোকেয়া মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য কেবল বই পড়া বিদ্যার উপর নির্ভর করাকে যথেষ্ট বলে মনে করেননি। বিভিন্ন রকম সৃজনশীল কর্মের সুযোগ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতারও পরিচয় দিয়েছেন। চারু ও কারুকলা শিক্ষাদানকে যে তিনি কেবল তাত্ত্বিকভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন তা নয়। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের শ্রেণী সময়তালিকাতে এসব বিষয়ের জন্য সময় বরাদ্দ রেখে নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।[৩৪]

মানসিক শিক্ষার সঙ্গে শারীরিক শিক্ষাকেও রোকেয়া সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন "শিক্ষা মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই"। তার মতে, দেহে স্ফূর্তি না থাকলে মনেও স্ফূর্তি থাকে না। শরীরে স্ফূর্তি আনতে হাত, গা খাটানো অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রম করার দরকার। তিনি আরও বলেছেন শুধু ঘোরাফেরা করলেই ব্যায়াম হয় না। প্রতিদিন অন্তত আধ ঘন্টা দৌড়াদৌড়ি করা দরকার।[৩৫] শুধু তাই নয় শারীরিক শিক্ষার জন্য তিনি মেয়েদেরকে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, ঢেঁকির সাহায্যে ধানভানা, যাঁতার আটা প্রস্তুত করা এবং সব রকম ঘরের কাজ শেখাতে বলেছেন। তিনি শুধু লাফঝাঁপ, নাচ ইত্যাদির চেয়ে ঐ ধরনের শরীরচর্চা শতগুনে শ্রেয় বলেছেন।[৩৬] আমাদের দেশে অবশ্য বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত খেলাকে প্রাণীর উদ্দেশ্যহীন, অসংলগ্ন ও অনর্থক আচরণ বলেই বিবেচনা করা হয়েছে।[৩৭] সেক্ষেত্রে

বেগম রোকেয়া বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই খেলা বা শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন এবং তার বিদ্যালয়ে নিয়মিত ড্রিল করানোর ব্যবস্থা করেছেন।

পদ্ধতি

বেগম রোকেয়া তার শিক্ষা ভাবনাকে রূপদান করার জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে বাস্তববাদী ও প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন বলেই প্রতীয়মান হয়। সাধারণভাবে তিনি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে না বুঝিয়া থাক, আমাকে জিজ্ঞাসা কর আমি বুঝাইয়া বলি।[৩৮] তার এই বক্তব্য থেকে শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা সম্বন্ধে তার মত বোঝা যায়। তার মতে এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা কেবল দাতার ও শিক্ষর্থীর ভূমিকা কেবল গ্রহীতার হবে নয়, বরং শিক্ষা দানের কাজ প্রশ্ন ও উত্তরের আদান প্রদানের মাধেমে অগ্রসর হবে। রোকেয়া এক জায়গায় বলেছেন " আমি কাল সকাল বেলা মেঘমালা দেখিয়া ও দেখাইয়া প্রশ্ন করিব।[৩৯] তার এই বক্তব্যে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ফুঁটে উঠেছে। বাস্তববাদীরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা দানের পক্ষপাতী ।

কেবল পর্যবেক্ষণ নয়, শিক্ষালাভের পদ্ধতি হিসেবে অনুসন্ধান, শ্রেণীকরণ ও পরীক্ষণের উপরেও রোকেয়া গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ভূগোল পাঠদানের সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তিনি অনুসন্ধান পদ্ধতি প্রয়োগ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন।[৪০] আধুনিক বিজ্ঞানীরা জানেন প্রাপ্ত উপাত্তের শ্রেণীকরণ জ্ঞানকে সুশৃঙ্খল ও বোধগম্য করার একটি অপরিহার্য পন্থা। রোকেয়াও এটি ব্যবহারের কথা বলেছেন।[৪১] পরীক্ষণ ছাড়া বিজ্ঞান শেখা সম্ভব নয়। তাই তিনি বিজ্ঞানের বিষয়গুলি পরীক্ষণের মাধমেই শেখাতে চেয়েছেন। এই সব পরীক্ষণের মাধমে শিক্ষার্থীরা খেলার আনন্দও উপভোগ করবে বলে তিনি মনে করতেন। অর্থাৎ রোকেয়া চাইতেন আনন্দঘন পরিবেশে খেলার ছলে পরীক্ষণ করতে করতে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের সত্য বা মূলসূত্রগুলো শিখে নিবে।[৪২] কেবল বই পত্রের উপর নির্ভরতার বদলে গল্পচ্ছলে শিক্ষাদেয়ার কথাও তিনি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।[৪৩] শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ও কার্যকর করার ব্যাপারেও রোকেয়া সচেতন ছিলেন। তাই তিনি চার দেয়ালের বাইরে প্রকৃতির মাঝখানে শিক্ষার্থীদের ভ্রমণ বা বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের সুযোগ করে দিয়ে প্রকৃতি পাঠ, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। এভাবে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বিপদাপদ ও দূর্গমতাকে উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা উচিত বলেই তিনি মনে করতেন।[৪৪] শুধু জ্ঞান, বিজ্ঞান নয় ,রোকেয়ার মতে, ধর্ম বিশ্বাস দৃঢ় কারার জন্যেও ভ্রমণের আবশ্যকতা রয়েছে। তার মতে ,ঈশ্বরের সৃষ্টি যত বেশি দেখা যায়, ততই তার প্রতি ভক্তি বাড়ে। চোখ কান ঠিকমত ব্যবহার করে সৃষ্টি জগতের পরিচয় না নিলে স্রষ্টাকে ভালভাবে চেনা যায় না।[৪৫] সৃষ্টি জগতের মাধ্যমে স্রষ্টাকে চিনতে হলে কোরানের অর্থ বলা ও তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার বলে রোকেয়া মনে করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলার তাগিদ দেন।

কোরানের নির্দেশ অমান্য করার কারণেই মানুষ অল্প আঘাতেই বা প্ররোচনাতেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় বলেই তিনি মনে করেন। তিনি নামাজে ব্যবহৃত দোয়া কালামের অর্থ বুঝিয়ে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন।[৪৬]

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের আচরণ বা ভূমিকা এবং যোগ্যতাকে রোকেয়া অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন। তিনি মনে করেন শিক্ষকের ভূমিকা হবে আন্তরিকতাপূর্ণ, হাসিখুশি ও সহিষ্ণু, শাসন ও শৃঙ্খলা বিধানে মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত। রোকেয়ার মতে, শিক্ষকের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ব্যাপক ও সমন্বিত জ্ঞান থাকতে হবে যাতে তিনি শিক্ষার্থীর প্রশ্নগুলোর সম্যক উত্তর দিতে পারেন।[৪৭] নারী শিক্ষা বিস্তারের উপরোক্ত প্রচেষ্টা থেকে বোঝা যায় নারীর মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র হাতিয়ার যে শিক্ষা, এ সম্বন্ধে তার বিন্দু মাত্র দ্বিধাবোধ ছিল না। তাই তিনি তার সমগ্র জীবন নারী শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিবেদন করে গেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন, কেবল তাত্ত্বিক শিক্ষা বা বই পড়া বিদ্যায় কোন উপযোগিতা নেই। তাই তিনি তত্ত্বের ব্যবহার সম্পর্কেও জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। শিক্ষার প্রচলিত ধারণাকে অতিক্রম করে, শিক্ষা কাকে বলে এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করতে তিনি প্রয়াস পেয়েছেন। রোকেয়ার গভীর উপলব্ধি থেকে উৎসারিত সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতার অনুশীলিত উন্নয়নই শিক্ষা।

এ রকম চিন্তাধারার ফসলই হলো সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গালর্স স্কুল। তার স্কুলে শিক্ষণ পদ্ধতির অভিনবত্ব অভিভাবকদের আকৃষ্ট করেছিল। ফলে প্রাথমিক শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। আর প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের এই সংখ্যা বৃদ্ধি বাঙালি মুসলিম নারী শিক্ষার ইতিহাসে একটি গুরত্বপূর্ণ ঘটনা।

শিক্ষা বিস্তারে রেকেয়ার অবদান

বিশ শতকের প্রথম দশকে বেগম রোকেয়া সর্ব প্রথম বাংলার মুসলিম নারী সমাজের মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে আসেন। নারী মুক্তি আন্দোলনকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তিনি লেখনীর মাধ্যমে সমাজকর্মীরূপে জীবন নিবেদন করেন এবং নারী শিক্ষা বিস্তারকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন।[৪৮] দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বেগম রোকেয়া অনুধাবন করেছিলেন যে, নারীজাগরণের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে শিক্ষা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষার প্রভাবেই নারী সচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধে জাগ্রত হবে, আর এই বোধ জাগলে স্বাভাবিকভাবেই সমাজে নারী নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। তখন নারীরা প্রগতির পথে এগিয়ে যাবার সাহস সঞ্চায় করবে। তাই নারী শিক্ষার প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি নারী শিক্ষার সপক্ষে যুক্তিভিত্তিক মতবাদ প্রচার করেন। এছাড়া নারী শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে তিনি সাখাওয়াাত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল নামে এক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নারী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি স্কুলটিকে একটি আদর্শ মুসলিম বালিকা

বিদ্যালয়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে দুই দশকের অধিককাল অক্লান্তভাবে কাজ করে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বেগম রোকেয়ার শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা ও কর্ম বিচার বিশ্লেষণ করলে তাতে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের নতুন নতুন মাত্রা স্পষ্ট হয়ে আসে। শিক্ষার মাধ্যমে নারীর সামাজিক উত্তরণে তার বাস্তববাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি সে সময়কার বাস্তবতার নিরিখে বিস্ময়কর মনে হয়। এছাড়া অবরোধ প্রথাকে তিনি সমাজে নারীর স্বকীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের সবচেয়ে বড় বাধা বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন এ বাধার কারণেই বাঙালি সমাজে, বিশেষত বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীর মর্যাদা ও ভূমিকা যথাযথ স্থান লাভ করতে পারছে না। সর্বনাশা এ অবরোধের কবল থেকে নারীকে রক্ষা করে সুস্থ ও বলিষ্ঠ এক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই রোকেয়া সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তবে সন্তান লালন পালনে মায়ের শিক্ষার বিষয়ে তিনি যা বলেছেন তাতে বিস্ময়বোধ জাগে। সন্তান পালনকে তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার হিসিবে আখ্যায়িত করেছেন। এর গুরুত্ব তুলে ধরে বলেছেন, ‘ইতিহাসে যত মহৎ লোকের নাম শুনা যায়, তাঁহারা প্রায় সকলেই সুমাতার পুত্র ছিলেন। ..শিশু স্বভাবতই মাতাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসে, তাহার কথা সহজে বিশ্বাস করে। মাতার প্রতি কার্য, প্রতি কথা শিশু অনুকরণ করিয়া থাকে। প্রতি ফোঁটা দুগ্ধেও সহিত মাতার মনোগত ভাব শিশুর মনে প্রবেশ করে।[৪৯] এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন, মাতা ইচ্ছা করিলে শিশু হৃদয়ের বৃত্তিগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া তাহাকে তেজস্বী, সাহসী, বীর, ধীর সবই করিতে পারেন। অনেক মাতা শিশুকে মিথ্যা বলিতে ও সত্য গোপন করিতে শিক্ষা দেয়, ভবিষ্যতে সেই পুত্রগণ ঠক, জুয়াচোর ও ডাকাত হয়। অযোগ্য মাতা কারণে-অকারণে প্রহার করিয়া শিশুর হৃদয় নিস্তেজ (spirit low) করে..।[৫০] তার মতে, মাতাই আমাদের প্রথম, প্রধান ও প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী।[৫১] এখানে আধুনিক সামাজিক মনোবিজ্ঞান বিষয়ে বেগম রোকেয়ার জ্ঞানের বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুত বেগম রোকেয়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে আত্মিক বিকাশের সাথে বৈষয়িক ইহজাগতিক উন্নতি সাধন করে নারীর সমাজসত্তাকে বিকশিত করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষাকে বাস্তব জীবন সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়, কর্মালয় এবং আতুরাশ্রম-কে একীভূত করে তারিণী-ভবন এর কথা চিন্তা করেছেন। ‘সাথে সাথে বিদ্যালয় বিভাগে হিন্দু, খ্রিস্টান শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের কথা চিন্তা করে এবং তাঁহারা সকলে যেন এক মাতৃগর্ভজাত সহোদরার ন্যায় মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতেছেন বলে ইউরোপী রেঁনেসাসীয় উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।’[৫২] পদ্মরাগ উপন্যাসে বিবৃত তাঁর শিক্ষাচিন্তা মানসের পরিচয়ে বিস্ময়বোধ না করে পারা যায় না। এখানেও তার শিক্ষা ভাবনায় জীবনমুখীনতার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

এ থেকেই দেখা যাচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রই তিনি আধুনিক বাস্তববাদী, যুক্তিসিদ্ধ বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা-চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন সুস্পষ্টভাবে। যে সময়ে মুসলমান মেয়েদের

শিক্ষা গ্রহনের কোন ব্যবস্থা ছিল না, সেই ব্যবস্থাটি তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে যথাযথভাবে করতে পেরেছেন।

উপসংহার

বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে বেগম রোকেয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে শুরু করে আমৃত্যু বেগম রোকেয়া বিরামহীনভাবে সমাজসেবা করে গেছেন। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী সমাজকে অজ্ঞ ও অবরুদ্ধ রেখে দেশ তথা জাতির উন্নতি অসম্ভব। তাই নারী মুক্তি আন্দোলনে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করেন। অজ্ঞতা অশিক্ষার কষাঘাতে অবরুদ্ধ নারীর মুখে রোকেয়া মুক্তির বাণী পৌছে দিয়েছেন। শত বাধা বিপত্তি তাঁকে তাঁর কর্ম থেকে মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত করতে পারেনি। আধুনিক মুসলিম সমাজ উদ্ভবে বাঙালি মুসলিম নারীসমাজে শিক্ষা বিস্তার ও প্রগতিশীলতার জয়যাত্রার স্রোতে নারীসমাজকে সামিল করার কাজে প্রেরণা যুগিয়ে গিয়েছেন। এখানেও রোকেয়া একজন আদর্শবাদী দায়িত্বশীল সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন। এই ভূমিকাকে আরো কার্যকর করার প্রত্যাশায় তিনি নারীর দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা নিয়ে লিখেছেন। নারীর প্রতি সামাজিক অত্যাচার ও বৈষম্য তাকে ব্যথিত করেছে। এই বেদনাবোধ প্রকাশ পেয়েছে তার বিভিন্ন রচনায়। বেগম রোকেয়ার মনে তীব্র দুঃখবোধ ও ঘনীভূত বেদনার পাশাপাশি সুপ্ত প্রত্যাশাও ছিল। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও নারী সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। এবং সমাজে পুরুষের পাশাপাশি তাদের অবস্থানের মাত্রা ও গভীরতা নির্ধারণ করবে। আর রোকেয়ার মতে, "আত্নসচেতন সত্তা মাত্রই বড় কোন ক্ষেত্র, উচ্চতর কোন কোন আদর্শের জন্ম দিতে চায়।"[৫৩] এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নারীমুক্তি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন–একজন সফল সমাজকর্মী হিসেবে এখানেই বেগম রোকেয়ার বিরাট সার্থকতা। এরকম একটি মহতী প্রচেষ্টার জন্য আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই। আর এ জাতীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষই নানা ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করে। কারণ তাঁরা সমকালীন সীমাবদ্ধতা থেকে সেই সামাজিক পরিমণ্ডল ভেদ করে, নিজেদের জাতি ও শ্রেণীগত অবস্থান অতিক্রম করে সমাজে আপন আপন ভূমিকা নির্ধারণ করে নেয়। বস্তুত "নিজ নিজ শ্রেণীর ভাবাদর্শে প্রত্যেকের ব্যক্তিমানস গড়ে উঠলেও, যে মানস পরবর্তী ধাপে সময়ের অগ্রসর চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে নিজের সত্তাকে যুক্ত করে নেয়, সেই মানসই ইতিহাস রচনা করে। বেগম রোকেয়া এরকমই একটি ঐতিহাসিক ব্যক্তিসত্তা।"[৫৪]

তথ্য নির্দেশ :

১. মিসেস আর, এস, হোসেন, *অবরোধবাসিনী* (কলিকাতা ১৯২৬), 'উৎসর্গ পত্র'; শাহানারা হোসেন, 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণ', *সাহিত্যিক,* ১৪শ বর্ষ, বসন্ত সংখ্যা ১৩৮৪, পৃ-২০০।

২. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, *বাংলা সাহিত্য সওগাত যুগ* (ঢাকা: নূরজাহান বেগম কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৮৫), পৃ-৫৩৭।
৩. শামসুন নাহার, *রোকেয়া জীবনী* (প্রথম স্কুল সংস্করণ, ঢাকা; শ্রী রমেশচন্দ্র দত্ত মজুমদার, ১৯৫৮), পৃ-১৮।
৪. উদ্ধৃতি, মোতাহার হোসেন সুফী, *বেগম রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ-৯।
৫. শামসুন নাহার মাহমুদ, *রোকেয়া জীবনী*, ঢাকা, ১৯৫৮,পৃ-১৮।
৬. শামসুন নাহার মাহমুদ, 'মুসলিম বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা', *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৪শবর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৭, পৃ-৫৬।
৭. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বেগম রোকেয়া*, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ-১০।
৮. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, '*বেগম রোকেয়া* : নারী-শিক্ষা', বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ-১৮।
৯. *রোকেয়া-রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ-২১।
১০. প্রাগুপ্ত,পৃ-৩৩।
১১. আবদুল কাদির সম্পাদিত, *রোকেয়া রচনাবলী*, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ-২৭।
১২. '*স্ত্রীজাতীর অবনতি*', মিসেস আর. এস. হোসেন, *মতিচূর*, প্রথম খন্ড (পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা: শ্রীগুদাস চট্টপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৪), পৃ-২৮, ২৯।
১৩. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-১৮।
১৪. প্রাগুপ্ত,পৃ-৫১।
১৫. প্রাগুপ্ত,পৃ-৫১।
১৬. মিসেস আর. এস. হোসেন, '*সুবেহ সাদেক*', *মোয়াজ্জিন*, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৩৭, দ্রষ্টব্য, *রোকেয়া রচনাবলী*, আবদুল কাদিও সম্পাদিত, ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ-২৯৯।
১৭. ঐ, পৃ-২৯৯।
১৮. ঐ, পৃ-২৯৯।
১৯. শামসুন নাহার, প্রাগুপ্ত, পৃ-৫৬।
২০. ঐ, পৃ-৪৭।
২১. Mrs. R.S. Hossain, *Educational Ideals for the Modern Indian Girl's.* The Mussalman, Vol.XXV. T. W. Edition.Vol.VII, March 5,1931.No,26, p-7.
২২. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত,পৃ-২৭২।
২৩. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত,পৃ-৪৫-৪৬।
২৪. ঐ, পৃ-৪৬-৪৭।
২৫. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত,পৃ-২৯৯।
২৬. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত,পৃ-১২৮।
২৭. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-১০৫, ৯৭, ১১১, ১১৩।
২৮. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-৩৭৬, ৯৭।
২৯. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-৯৭, ১১২,১১৩, ১১৫।

৩০. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-২৫৮।
৩১. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-২৭৭।
৩২. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-৪৪।
৩৩. J.S. Brubacher, *A History of the Problems of Education*, New York and London, McGraw Hill Book company, inc, 1947p-284.
৩৪. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-২৭২।
৩৫. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-১৬-১৭।
৩৬. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-২৭২।
৩৭. অরুণ ঘোষ, *'খেলা ও শিক্ষা' শিক্ষাবিজ্ঞানের দর্শন ও মূলতত্ত্ব*, এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইর্স, কলিকাতা, ১৯৮৬ পৃ-১৯৬।
৩৮. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-১০০।
৩৯. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-১০৮।
৪০. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-১১০-১১১।
৪১. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-১০৩।
৪২. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-১০১।
৪৩. রোকেয়া রচনাবলী, প্রগুপ্ত, পৃ-১১৫।
৪৪. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-১০২, ১০৭, ১১০-১১২।
৪৫. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-১০৮।
৪৬. প্রগুপ্ত, পৃ-১০৮, ১৭৬-১৯০।
৪৭. প্রগুপ্ত, পৃ-৯৫, ১০৩।
৪৮. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : *চিন্তা চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২)।
৪৯. *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রগুপ্ত, পৃ-৫২।
৫০. প্রগুপ্ত, পৃ-৫৩।
৫১. প্রগুপ্ত, পৃ-৫৩।
৫২. প্রগুপ্ত, পৃ-৩২৯.।
৫৩. বেগম আকতার কামাল, *'রোকেয়া-মানসের মূলসূত্র,'* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৩৫ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৮৯,পৃ-৪৩।
৫৪. ঐ, পৃ-৪৩।